Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 824 - 831
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎ সাহিত্যের আলোকে শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা

মানস কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : manasdas725@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Social evils, condition of women, lower class, patriarchal society, caste discrimination, superstition

Abstract
'Literature can act as a mirror of society'. This is very much true about the writing of all great writers, Sarat Chandra chattopadhyay being one among them. The vast corpus of his writing- novels, short stories, essays- depicted superstition, social injustice and condition of women of his time. But behind all his writings was his silent intention to inform and educate his readers about evils of society as he saw it. Sarat Chandra Chattopadhyay was also a very socially conscious person and as a very popular writer, he did not write various stories, novels and essays only for the purpose of writing literature, but also from his firm belief that it was his moral duty for creating social consciousness against various social evils. He firmly believed that, one should try to remove various injustices and superstitions from society by writing against them. Sarat Chandra believed that the root of social evils and problems stem from socio-economic discrimination, the disturbing condition of lower caste and class, caste discrimination, the way women were treated in a patriarchal society, particularly in contemporary Hindu society. These social evils were so firmly rooted in the minds of people that it was impossible for people to get rid of these social evils and malpractices unless they were completely uprooted.

In the article under discussion, there will be an attempt to analyze how Sarat Chandra chattopadhyay, through his various novels, stories and articles, tried to form a public opinion among his readers by writing against various social evils and various social injustices. In short, the main aim of this research paper is to reveal how his social consciousness has been revealed through the Sarat Chandra's literature, that is, how much Sarat Chandra was a socially conscious person, in the light of the literature he created.

Discussion

ডক্টর অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন, -

"সাহিত্য হল সমাজ-মানসের দর্পণ।"[১]

অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কারণ সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন রূপকের আড়ালে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্রটিই তুলে ধরেন। আর একজন সাহিত্যিক যে সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করেন তা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর মানসিকতা ও মননশীলতার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষত উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে সমাজের রূঢ় বাস্তব চিত্রটিই পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেন। আর এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনাগুলি ছিল মূলত রূঢ় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার প্রতিবিম্বন। তিনি বাস্তব জীবন থেকে যা উপলব্ধি করেছেন তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তিনি মানুষের জীবনের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী, তাদের ছোট্ট ছোট্ট অনুভূতির কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন বলেই তো তিনি ‘কথা সাহিত্যিক’।

শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সমাজসচেতন লেখক। তিনি মনে করতেন সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা আছে এবং সাহিত্যিক তাঁর এই সামাজিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মের নান্দনিক মূল্য যেমন অপরিসীম, তেমনই তার সামাজিক মূল্যও কোন অংশে কম নয়। বস্তুত সৃষ্টিশীল লেখকের কাজই হল জনসচেতনতার স্ফূরণ ঘটানো। একইভাবে শরৎচন্দ্রও তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বস্তুতপক্ষে সমাজের দারিদ্র-পীড়িত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের বেদনা শরৎচন্দ্রের কলমে উন্মোচিত হয়েছে; তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আকুতি তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত 1933 সালে তাঁর 57তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিভাষণে উল্লেখিত শরৎচন্দ্রের বক্তব্য থেকে তাঁর এই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। এখানে তিনি বলেন —

> “…সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, …তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।”[২]

এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন —

> “সমাজে যাঁহারা বর্জিত ও উপদ্রুত তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।”[৩]

এছাড়া আমরা যদি শরৎ সাহিত্য পাঠ করি তাহলে দেখতে পাবো শরৎচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শ্রেণীবিভক্ত, কুসংস্কারে আবদ্ধ, স্ববিরোধিতায় পূর্ণ হিন্দুসমাজের যে বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই সুনিপুণ দক্ষতার সাথে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয় সমাজে যে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা ছড়িয়ে আছে তা থেকে কি করে সমাজকে মুক্ত করা যায় সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি মনে করতেন, “আমাদের দেশের সমাজে জাত-পাতের সমস্যা, ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যা কত খারাপ এ সম্পর্কে শুধু দুটো বক্তৃতা দিয়ে এ জিনিসকে সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। কারণ এটা সংস্কারের রূপে এমন করে মনোজগতে ঢুকে গেছে যে শুধুমাত্র দুটো বক্তৃতা বা ভালো কথা বলে এর হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।” সেই জন্য সংস্কার কী মারাত্মক তা তিনি নানান ভাবে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আমাদের অনেক দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোড়ামীকে কষাঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমরা যতই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হই না কেন আমাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা ও সংস্কার দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধে ছিল। এমনকি বহু ক্ষেত্রে এখনো আমরা পুরোপুরি এর থেকে মুক্ত হতে পারিনি। বিশেষ করে ভারতীয় নারীকে এই সংস্কারের বাঁধনে সবচেয়ে বেশি বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শরৎচন্দ্র এই অতি সাধারণ কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সতীত্ব রক্ষার দোঁহাই দিয়ে নারী জাতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখতে চায়, এর অন্যথা হলে তার কপালে জোটে অসীম লাঞ্ছনা। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে কুলটা, দুশ্চরিত্রা বা চরিত্রহীনা অপবাদ দিয়ে সমাজ বহির্ভূতও করা হত। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হয় তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হত নতুবা পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে হত অথবা সবশেষে মৃত্যু ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকত না। শরৎচন্দ্রই প্রথম তাঁর *'চরিত্রহীন'* উপন্যাসে ভারতীয় নারী সমাজের এই দুর্বিষহ যন্ত্রনার চিত্র পাঠক বর্গের কাছে তুলে ধরেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাঁর সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে চায় না, জীবনে চরম দারিদ্রতা বা দুর্বিসহ শোষণ-যন্ত্রনার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য, অথবা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির কারণে কোন উপায়ান্তর না দেখে বহু নারী গণিকা বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়। আর নারীর এই অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের রসদ যে তিনি বাস্তব জীবন থেকে সঞ্চয় করেছিলেন, এমনকি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে তাঁকে দুর্নামের ভাগীদার হতে হয়েছিল তার বর্ণনা লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের এক চিঠি থেকে পাওয়া যায় —

> "আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ছয় সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! ...দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়। পয়সার জন্যে নয়, পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।"[৪]

এছাড়া এই সতীত্বের সংস্কার কি মারাত্মক এবং তা কিভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়ে আছে তা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনার মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনীকার শ্রী গোপালচন্দ্র রায় এর লেখা থেকে আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই। শ্রী গোপালচন্দ্র লিখেছেন —

> "তখন শরৎচন্দ্র বালক, পাড়ায় এক বাল বিধবা ছিল, তাহাকে তিনি দিদি বলিতেন। মেয়েটি অত্যন্ত পরোপকারী ও শান্ত। সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিত। ছেলেমানুষীর ঝোঁকে শরৎচন্দ্র একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার এই দিদিকে একটু ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের নিমগাছে উঠিয়াছিলেন। যেই তিনি নাকি সুরে দিঁ-দিঁ বলিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি দেখিলেন একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি দিদির খাটের নিচে লুকাইয়া পড়িল।"[৫]

এই ঘটনা নিয়ে শরৎচন্দ্র পরে মেদিনীপুরে এক সভায় বলেছিলেন, "এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয়তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্ব থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন দুঃখীকে দান করে যে মহত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে নাই পেরে থাকে তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না? এই জন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।"

একইভাবে *'শ্রীকান্ত'* উপন্যাসে শ্রীকান্ত যে নিরুদিদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তাতেও শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। শ্রীকান্তের মুখে শোনা যায় -

> "বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ

> ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালোবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষ-স্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিমশয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায় লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোন স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।"[৬]

শরৎচন্দ্র তাঁর *'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি'* প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন –

> "... অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। ...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়। ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"[৭]

বস্তুতপক্ষে সতীত্বকে তিনি নারীর ভালো-মন্দের মানদন্ড বলে মনে করেননি বলেই তাঁর সাহিত্যে সমাজ বহির্ভূতা ও পতিতা নারীদের জীবনও এত সম্মানের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে দু'একটি স্থানে পতিতা চরিত্র দেখা গেলেও সেগুলিকে সমাজের চোখে ঘৃণার পাত্রী করেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রই প্রথম সীমাহীন সহানুভূতির সাথে এই পতিতাদের চরিত্র আলোচনা করেছেন এবং নারীত্বের মাধুর্য ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শরৎচন্দ্র এক দিকে যেমন এই সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতা মেয়েদের কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাস, পতিতালয়ের বাস্তব জীবনধর্মী চিত্র, তাদের দুঃখ বেদনা ও প্রণয়ার্তির হৃদয়স্পর্শী বিবরণ গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ থেকে সযত্নে চিত্রিত করেছেন, তেমনি এই সমাজ পরিত্যক্তা পতিতাদের মধ্যেও যে মানবিক ও হৃদয়বৃত্তিগত গুণগুলি থাকতে পারে তা তিনি *'দেবদাস'* ও *'চরিত্রহীন'* উপন্যাসে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি আমাদের সমাজে পরিত্যক্তদের সমস্যাকে এক সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে পাঠককে সমাজ সচেতন করে তুলেছেন।

শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি শরৎচন্দ্র শ্রেণীবিভক্ত ও জাতিভেদ প্রথার অত্যাচারে জর্জরিত এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ ভারতীয় সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের হৃদয় বিদারক যন্ত্রনার কথা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করে আপামর পাঠক সমাজের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ সামাজিক দিক থেকে না হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি নিজেই ছিলেন এই শ্রেণীর প্রতিভূ।[৮] কেননা জন্মের পর থেকেই শরৎচন্দ্রকে যে চরম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে সেকথা তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। তাঁর নিজের কথায় –

> "এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে-তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগদীর বাড়ীতে আহার করেছি ...তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ।"[৯]

এছাড়া লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে এও লিখেছেন যে —

> "বড় দরিদ্র ছিলাম, — ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাট্‌বে।"[১০]

অর্থাৎ শরৎচন্দ্রকে শৈশব থেকেই চরম আর্থিক দুরবস্থা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই হয়তো তাঁর রচনায় একদিকে যেমন গ্রাম বাংলার মানুষের প্রতি এত দরদ-সহমর্মিতা তেমন অপরদিকে তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর রূপটি ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয় শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু-সমাজের দলাদলি, নীচতা-নিষ্ঠুরতা, জাতিভেদ প্রথার কুফল, সমাজপতিদের ধর্মের ও কুসংস্কারের নামে যথেচ্ছাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাই পরবর্তীকালে শরৎ-সাহিত্যে প্রতিফলন এবং সমাজের সেই সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেনো না সমাজদ্রোহ ছিল শরৎচন্দ্রের মজ্জাগত। এমনকি তিনি একজন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীচতা, আচার-বিচারের নামে তাদের ভন্ডামির বিরুদ্ধে শাণিত আঘাত হানতে পিছুপা হননি। এরজন্য ব্যক্তিগত জীবনেও লেখক শরৎচন্দ্রকে সমাজপতিদের নির্লজ্জ শোষণের শিকার হতে হয়েছিল এমনকি সমাজে তাঁকে 'একঘরে' করে দেওয়া হয়েছিল।[১১] আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই শরৎচন্দ্রের বার্মা থেকে ফেরার পর হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকাকালীন তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্র থেকে। তিনি লিখেছিলেন—

> "...জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে' আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়...।"[১২]

সুতরাং শরৎচন্দ্র সমস্ত নিন্দা, গ্লানি বা নির্যাতনের ভয়কে উপেক্ষা করে নির্ভিক ভাবে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং সমাজের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। আর এক্ষেত্রে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে তিনি এমনভাবে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন যাতে তা মানুষের মনন জগতে ক্রিয়া করে ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি ক'রে সমাজের কদর্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার চেতনাকে ক্রিয়াশীল করে। এইভাবে একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবীর যা কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন তা-ই আজীবন করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর *'শ্রীকান্ত'* ও *'পল্লীসমাজ'* উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের উপর উচ্চবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের নিরন্তর অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন। গ্রামের জমিদার-গোমস্তা-সম্পদশালী মানুষেরা কিভাবে হতদরিদ্র মানুষদের সর্বস্ব গ্রাস করে তাদের নিঃস্ব করে ফেলে তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন – "তাঁদের লোলুপদৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে পড়ে তাদের কৃষি জমিতে। তারপর তাদের ভিটেমাটি টুকুও আত্মস্থ করতে তাদের বিবেকে আটকায় না। কখনো দেনার দায়ে, কখনো বা অন্য নানা কৌশলে তারা বাধ্য করে এই দরিদ্র মানুষদের জমি বিক্রি করতে।" এছাড়া *'শ্রীকান্ত'* উপন্যাসে উল্লেখিত গঙ্গামাটি গ্রামের অধিবাসীদের দূরবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন –

> "কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সৎগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না। ...পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোনো হিসাব কেহ কখনো রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনার কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।”[১৩]

শরৎচন্দ্রের *‘পল্লীসমাজ’* উপন্যাসেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ছত্রছায়ায় পুষ্ট গ্রাম্য জমিদার ও সমাজপতিরা কিভাবে সাধারণ মানুষের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালায় তা বর্ণিত হয়েছে। এই স্বার্থলোলুপ মানুষরা নিজেদের স্বার্থপুরণে এতটাই উন্মত্ত থাকে যে গ্রাম বাংলার অসহায় চাষী, জেলে, বাগদী, বাউরি, ডোমেদের কান্না তাদের মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। তারা নির্বিচারে এই অসহায় মানুষগুলোর উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। তাইতো লেখক সমগ্র সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, “পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসংকোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায় এবং কেমন করিয়া পায়, কেমন করিয়া দেশের আইনকে ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। ...অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যহতি দেয়, মৃত সমাজও তেমনি অন্যদিকে তাদের দুষ্কৃতির কোন দন্ডবিধান করে না।” উপরন্তু বহু শিক্ষিত ভারতবাসী এইসময় ইংরেজ শাসনকে সাদুবাদ জানিয়েছিলেন। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চালু করা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র এর স্বরূপকে যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন— “দীঘি নেই, পুকুর নেই কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়... ম্যালেরিয়া, কলেরা হরেক রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।” শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে শিল্পব্যবস্থার বিকাশের(?) ফলে সৃষ্ট শিল্প-শ্রমিকদের দুর্বিসহ জীবনযাত্রার কথাও তাঁর রচনার ধরা পড়েছে। তাঁর ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে বার্মামুলুকে ভারতবর্ষীয় কুলি লাইনের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালীর বস্তুনিষ্ট চিত্র আছে, ‘শেষপ্রশ্নে’ আছে আগ্রা শহরতলীতে চামড়া কারখানায় কর্মরত মুচিদের মজুর-বস্তির বর্নহীন জীবন প্রবাহ, ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে রেলওয়ের কন্সট্রাকশানে কর্মরত শ্রমিকদের রোগ-শোক ও দুঃখভরা জীবনের কাহিনীকে পাই, ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে পরিনতিতে গ্রামীণ অবহেলিত মানুষটিকে চটকলে কাজ খুঁজতে যেতে দেখা যায়।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভাবেই নয়, জাতিগত ভাবেও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষরা কিভাবে শোষিত হয় তাও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি গ্রামীন হিন্দুসমাজের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের রূপ — নিম্নবর্ণের মানুষের উপর সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের নির্মম শোষণ যন্ত্রণা। জাতিভেদ প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক অসাম্য, অত্যাচার ও অনাচার সমাজের বুকে কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তা শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজপতিরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ, অহংকার ও দম্ভের বেদীমূলে কি ভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষকে বলি দেয়, কত নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতায় প্রতিপক্ষকে বিশেষ করে নিম্নবর্গের লোকদের নানাধরনের সামাজিক শাস্তি বিধান করে গোঁড়া হিন্দু সমাজের তথাকথিত হিন্দুয়ানীকে কায়েম করতে চায়। একাধিক স্থানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন — এই নিম্নবর্ণের মানুষদের সমাজে অস্পৃশ্য ক’রে রাখা হয়েছে—বিবাহ থেকে মৃত্যু সর্বক্ষেত্রে তারা অধিকার বঞ্চিত। সম্প্রতি Shrirama-ও তাঁর ‘Untouchability and Stratification in Indian Civilisation’ নামক প্রবন্ধে দলিতদের সঙ্গে অস্পৃশ্যদের ধারণাটি জড়িত বলে দেখিয়েছেন।[১৪] সেকারণে শরৎচন্দ্রের *‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘বামুনের মেয়ে’, ‘হরিলক্ষী’* প্রভৃতি গল্পে হিন্দু সমাজের অতি নিচু দুলে-বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের বঞ্চনার চিত্রটিও পরিস্ফুটিত হয়েছে। একই সাথে এই গল্পের মধ্য দিয়ে যেমন নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণী সমাজে সমাজে নানাভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলেও তারাই যে সভ্যতার মূল বাহক তা এখানে দেখানো হয়েছে। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর ‘রাশিয়ার চিঠি’- তে এদের ‘সভ্যতার পিলসূচ’ বলেছেন।

বস্তুত পক্ষে শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। সমাজদ্রোহ ছিল তাঁর মজ্জাগত। আর তিনি অত্যন্ত সমাজ সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এমন সুচারু ভাবে সমাজের বাস্তব

চিত্র তুলে ধরেছেন যা পড়ে পাঠকের মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন -

> "আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি— এইখানেই আমার সাহিত্য রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী এবং কোনটার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্তমনে বিদায় নিয়েছি...।"[১৫]

সুতরাং শরৎসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়— শরৎচন্দ্র একজন সাহিত্যিক হয়েও প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের ন্যায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের দুঃসহ শোষণ যন্ত্রনা ও দুঃখ-কষ্টের দিকটি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, এমনকি তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদও জানিয়েছেন। যা বর্তমান কালেও শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতাকে আরও একবার প্রমাণ করে।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, অশীন. ইতিহাস ও সাহিত্য, কলকাতা - 9, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ২৭

২. কুমার, শ্রী মদনমোহন. (সম্পা.), শরৎচন্দ্র, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৫. 2-রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (ইংরাজি ১৯৩৩ সাল) কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিভাষণ।

৩. বসু, সুভাষচন্দ্র. 'স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র', দে, বিশ্বনাথ. (সম্পা.) শরৎস্মৃতি, কলকাতা ৭৩, সাহিত্যম, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (১৯৭০ খ্রিঃ). পৃ. ৪৩

৪. 14-8-1919 তারিখে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি। দ্রষ্টব্য: রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৭৬

৫. রায়, শ্রী গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র (প্রথম খণ্ড), কলকাতা- 12, সাহিত্যসদন, ১৩৬৯, পৃ. ৪৪০

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব), অষ্টম পরিচ্ছদ, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, শুভম প্রকাশন, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৪২২ - ৪২৩

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩৭

৮. অধ্যাপক রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন - "...উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। ...ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেত মজুর, গরিব চাষী ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এই সংজ্ঞায় শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকেরাও..." অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কৃষক, শ্রমিক, শহুরে জনতা, আদিবাসী, নিম্নবর্ণের মানুষ এমনকি মহিলারাও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে বিদেশী শাসক, বণিক, পুঁজিপতি, দেশি অভিজাত, বুর্জোয়া ও উচ্চশ্রেণীর মানুষরা উচ্চবর্গের অন্তর্গত। সুতরাং নিম্নবর্গ কথাটি কেবলমাত্র বর্ণগত বা জাতিগত অর্থেই প্রযুক্ত নয়, পেশাগত, গুণগত এমনকি অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণী বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 824 - 831
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্রষ্টব্যঃ গুহ, রণজিৎ. 'নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ্যার দায়িত্ব', এক্ষণ ১৫-শ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৭

৯. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮

১০. কুমার, শ্রীমদনমোহন. (সম্পা.), শরৎচন্দ্র, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

১১. রায়চৌধুরী, অনির্বাণ. শরৎসাহিত্যে আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, চারুপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৪

১২. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ১৬৫

১৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব), শরৎ রচনাবলী (১ম খণ্ড), কলকাতা, শুভম প্রকাশন, বইমেলা ২০১১. পৃ. ৫

১৪. গুপ্ত, আনন্দগোপাল, 'দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ', সেন, সুজিত. (সম্পা.) ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভারতে দলিত আন্দোলন, গ্রন্থমিত্র, কোলকাতা, পৃ. ১৬৫

১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'তরুণের বিদ্রোহ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), শুভম প্রকাশন, কোলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৯৮